## ২৭শে মার্চ ২০২২

## ACTIVISM-এর সপ্তম প্রতিষ্ঠা দিবসের ভাষণ

# “সমাজবিজ্ঞানের দুনিয়ায় এক কল্পিত পরিক্রমা”


**অধ্যাপক গৌতমকুমার বসু**

**প্রাক্তন অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ**

**যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়**

উপস্থিত সমাজবিজ্ঞানের গবেষক,গবেষিকাবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠিত পন্ডিত ব্যক্তিগণ এবং যাঁরা পন্ডিত হতে চলেছেন আগামী দিনে, এর সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানে আগ্রহী যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের সকলকে এবং অবশ্যই ACTIVISM-এর যাঁরা সদস্য, যাঁরা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাচ্ছি। একটা কথা বারবার বলা হয়েছে যে মূল্যবান বক্তব্য। মূল্যটা খুব কঠিন ব্যাপার এবং বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী আমি, একটু ক্ষমা চেয়ে বলি, আমি কোনভাবেই সমাজবিজ্ঞানী নই। বিশিষ্ট তো নইই। কোন ভাবেই নই। সমাজবিজ্ঞানের যে বিশাল পৃথিবী আছে যেখানে অর্থনীতি থেকে নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সেই অসাধারণ বিস্তারের বা জ্ঞান বিদ্যার জগতে কোনোটির ওপরেই আমার বিন্দুমাত্র দখল আছে বলে আমি মনে করি না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেছি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ভালোবেসেছি এবং এই ভালোবেসেই কিছুটা এগিয়ে যাওয়া। কেউ যদি আমাকে বলেন মানব সমাজবিজ্ঞানের সাথে মানববিদ্যার কোন সম্পর্ক আছে কিনা সেখানেও আমি একজন নিতান্তই নবিশ এবং নিঃসন্দেহে অপাংক্তেয়। তবুও একজন

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে ছুঁয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলাম বা ছুঁয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম এই সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকগুলোকে। আমি মূলতঃ অর্থনীতি এবং ইতিহাসের সঙ্গে কিছুটা সম্পর্ক রেখেছিলাম। নৃতত্ত্বের সঙ্গে পরবর্তীকালে। সবার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়, কিছুটা খাপছাড়াভাবে হয়তো বলতে হবে অনেক ক্ষেত্রেই মনে হবে যে ব্যাখ্যাটা আমি করছি সেটা সঠিক নয়। ফলে সে দিক থেকে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এখানে শুধু একটা কথাই একটু বলে নিই। সৌরীশ আছেন, আপনারা আছেন – আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই - কারণ আপনারা আমাকে একটা সুযোগ দিয়েছেন যে আজকে - প্রায় দু'বছর বাদে আমি আবার ছাত্র ছাত্রীদের সামনে কিছু বক্তব্য রাখতে পারছি। দুটো বছর একেবারে অন্ধকারের মধ্যে ছিলাম। সেখানে কিছু বলবার ছিল না। ওই কয়েকটা  অনলাইন ক্লাস নেওয়া, যেগুলো অত্যন্ত ব্যথার ব্যাপার আর কি। আমি সমাজবিজ্ঞানের কিছুই জানি না – কিছুই বুঝিনা। শুধু এইটুকু বুঝি- একটা সমাজ আছে। সেখানে মানুষ আছে- তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা-যন্ত্রণা, সংগ্রাম নিয়ে সমাজ এগিয়ে চলে ভবিষ্যতের দিকে। সেই সমাজকে ও তার গতিময়তাকে সমাজবিজ্ঞানীরা কিভাবে দেখেছেন, অনুভব করেছেন- সেটাই আমি  ছুঁয়ে যেতে চাই। সেটাই আমার পরিক্রমা। সেইজন্যই পরিকল্পিত বা কল্পিত। কারণ কল্পনার জগতের বাইরে আমি যেতে পারি না।

যখন আমরা ছাত্র ছিলাম, যখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্লাস আমরা শুরু করলাম, একটা কথা আমাদের মাস্টারমশাইরা বারবার বলতেন,যে কোন রাষ্ট্র দার্শনিক- যে কোন সমাজ দার্শনিক - তাঁরা তাঁদের  সমাজের পরিপ্রেক্ষিত থেকেই বেরিয়ে আসেন। তাঁরা বলতেন যে এই সমাজের মধ্যে কতগুলি সংকটের মুহূর্তের মধ্য থেকেই তাঁরা সংকটের সমাধান করতে চান। সমাজকে এগিয়ে নিতে চান। পরবর্তীকালে যখন সামান্য লেখাপড়া করেছি তখন যেন মনে হয়েছে এই সমাজবিজ্ঞানের জগতে,  অন্ততপক্ষে যারা সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা করেন, এখনও করছেন এবং ভবিষ্যতে করবেন তাঁরা সম্ভবতঃ তিনটে মূল শক্তি দিয়ে বা তিনটে মূল উপাদান দিয়ে প্রভাবিত হবেন। প্রথম যে জায়গাটা আমার মনে হয়েছে সমাজবিজ্ঞানীরা চিন্তাভাবনা করেন, হয়তো বা কিছুটা দুশ্চিন্তাতেই ভোগেন। একটা Critical anxiety বোধ হয় যেকোনো সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র বা সমাজবিজ্ঞানীর প্রথম পাথেয় এবং সম্ভবতঃ প্রথম চ্যালেঞ্জ। আজকে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেছে সেই পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি অঞ্চলে আমাকে দীর্ঘদিন থাকতে হয়েছিল। তাদের গ্রামে শহরে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি, ধূলিধূসরিত রাস্তায় হেঁটে গেছি , নদীর জলে সাঁতার কেটেছি। কিন্তু যখনই কোন গ্রামে গেছি, যখনই কোন শহরে গেছি, একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি। প্রতিটি শহরের কেন্দ্রস্থলে, প্রতিটি গ্রামের কেন্দ্রস্থলে একটা বেদি থাকতো। বেদির চারদিকে ফুলবাগান। বেদিটি সম্পূর্ণ সাদা। তার উপরে বসে আছেন বা দাঁড়িয়ে আছেন একজন অল্পবয়সী ভদ্রমহিলা। কোলে একটি বাচ্চা, এবং সেখানে লেখা আছেঃ এই ঘটনা যেন আর কখনো না ঘটে। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছিল এবং যে কোনও যুদ্ধতেই যা হয়- ক্ষতির মুখোমুখি হন মহিলারা, ক্ষতির মুখোমুখি হন বাচ্চারা। এই 'আর যেন কখনো না হয়' হচ্ছে - এই ভয়াবহতার বিরুদ্ধে এক নিঃশব্দ প্রতিবাদ। তখন আমি ভেবেছিলাম যে যুদ্ধের ভয়াবহতা হয়তো শেষ। হয়তো আমার পিতামহ - তিনিই সর্বশেষ মানুষ, যিনি একটি যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখেছেন - আর যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখবেন না। আজকে আমি একজন সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র

হিসেবে যখন একটা যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখি এবং যুদ্ধের ফলে যে ছবিগুলো দেখি তখন আমার মনে প্রশ্ন জাগতে থাকেঃ পৃথিবীটা কোনদিকে চলেছে? একবার মনে হয় যেন Thucydides-এর সেই The Peloponnesian War - এর কথা যেখানে এথেন্সের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী গিয়ে মিলিয়ন (Melion) নামক দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে তাদের লোকদের ধরে বলছে তোমরা আত্মসমর্পণ করো। দেখছো তো আমাদের কত নৌবহর, আমাদের কত সৈন্য, আমাদের কত অস্ত্র। তোমাদের তো কিছুই নেই। মিলিয়নেরা বলছে যে এ সব সত্যি কিন্তু আমরা আত্মসমর্পণ করব না। তোমরা আমাদের সঙ্গে একটা ভদ্রলোকের চুক্তি করো। কি হলো? শেষ পর্যন্ত এথেন্স তাদেরকে দখল করল।

আমার মধ্যে প্রশ্ন জাগেঃ সেই সময়ের পর থেকে পৃথিবী অনেক এগিয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু এই যুদ্ধ- দুর্বলের ওপর বলবানের আস্ফালন কি শেষ হবে না? পরবর্তীকালে আরো অনেক পরে Immanuel Kant এসে বললেন যে না ওসব যুদ্ধ আর হবেনা। যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। এবং তিনি তাঁর তিনটি সূত্রের কথা বললেন এবং বললেন আগামী দিনে সারা পৃথিবীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার ফলে যুদ্ধের অবসান ঘটবে। মনে পড়ছে অ্যালফ্রেড টেনিসনের বিখ্যাত কবিতা Locksley Hall - এর কথা এখানে দেখা যাচ্ছে এক বিরাট contrast। তিনি দেখছেন এক অনাগত ভবিষ্যতকে- যেখানে যুদ্ধ থেমে গেছে, সামরিক বাহিনীর পতাকা গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। নির্মিত হচ্ছে- "the Parliament of Man, the federation of the world"। কিন্তু এ তো এক ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন। এই স্বপ্নের মাঝেই সামরিক বাহিনীর ঘন্টা বাজছে- ফিরে এস সৈনিকের আবাসে। এ তো না হয় গেল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক সংঘাতময় পরিণতি – স্বপ্নের মাঝে দুঃস্বপ্নের আবির্ভাব। ফিরে দেখি ঘরের পাশে আরশিনগর – সমাজবিজ্ঞানী ক্রমান্বয়ে মুখোমুখি হন এক অভিঘাতের। একটা উদ্বিগ্ন মনোভাব আমাদের মধ্যে সব সময় ঘুরে বেড়ায়। ক্ষমতার দম্ভ, পরাজয়ের গ্লানি, বাস্তুচ্যুত হওয়া, পরিবেশ ধ্বংস হওয়া আর মৃত্যুর হাতছানি সবই ঘটছে এই একবিংশ শতকে- এমন একটা সময়ে যখন আমরা গর্ব করি আমাদের সভ্যতাকে নিয়ে। এটা এমন একটা সময় যখন আমরা যারা সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র তারা প্রশ্ন করি- মানবিক চেতনা এবং মানবিক মূল্যবোধ কোনদিকে চলেছে? প্রশ্ন করিঃ সমাজবিজ্ঞানীর গভীর পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে কি দূর হবে আমাদের এই উদ্বিগ্ন মানসিকতা? আমরা কি উত্তরিত হব এমন এক নতুন উন্নততর বিশ্ব ব্যবস্থায় যেখানে থাকবে প্রশান্তির নিষ্কলুষ বাতাবরণ? এটা সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে একটা সংকট। তাঁরা সব সময় উদ্বিগ্ন। আজকে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়েও সে ভাবছে তাঁর পৃথিবীর কথা, তাঁর সমাজের কথা, তাঁর মানুষের কথা, তাঁর আশেপাশের কথা। আমি শুধু একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। আমার পাড়ায় একটি বাচ্চা মেয়ে আছে। একদিন হঠাৎ সেই মেয়েটি আমার বাড়িতে এসে ঢুকলো। এসেই সে সরাসরি আমার ঘরে, তার কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এসে বলল, আমাকে একটু আমাদের স্কুলে নিয়ে যাবে? আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। স্কুলে নিয়ে যাবো মানে? দু'বছর তো সে স্কুলে যায়নি। আমি না স্কুলের রাস্তাটা হারিয়ে ফেলেছি। আমি আমার স্কুলের রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। কোথাও যুদ্ধ হয়, কোথাও স্কুলের রাস্তা একটি শিশু হারিয়ে ফেলে, আবার কোথাও ন্যায়ের নামে অন্যায়কে চাপিয়ে দেওয়া হয়। আমার নিজস্ব ধারণা যাঁরা সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র বা ছাত্রী বা সমাজবিজ্ঞানী তাঁরা বোধহয় এই উদ্বিগ্ন এক পৃথিবীর মধ্যে বেঁচে আছেন, তাঁরা বেঁচে থাকতে চান বা এই সমাজকে আরো সুন্দর করতে চান।

এই আত্মসমাহিত উদ্বিগ্ন মানসিকতার ঠিক পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞানীরা সম্ভবতঃ তাড়িত হন এক অসমাহিত বিষন্নতা বা ভীতির দ্বারা। ভয়টা কি? আমি যে পৃথিবীটা দেখছি বা দেখতে চাই - আর, আমার সামনে যা ঘটে- এই দুইয়ের মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান। কিছুদিন আগে একজন নাইজেরিয়ান সাহিত্যিক Wole Soyinka - তিনি আফ্রিকার প্রথম সাহিত্যিক যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৮৬ সালে। তিনি সম্প্রতি একটি বই লিখেছেন- এই ২০২১ সালে বইটি প্রকাশিত হয়েছে – 'Chronicles from the Land of the Happiest People on the Earth'। বইটি আমি পড়িনি। দুটো রিভিউ পড়েছি একটা গার্ডিয়ান পত্রিকায়- (২৭.০৯.২০২১) আর অন্যটি নিউইয়র্কস টাইমস পত্রিকায় (২৮.০৯.২০২১)। সেখানে তিনি আফ্রিকায় এক কল্পিত সমাজের কথা বলছেন- যেখানে দুর্নীতি আছে, যেখানে বিশৃঙ্খলা আছে এবং সেখানে এগুলো সব স্বাভাবিক। তবুও সেখানে লোকে সুখী। প্রতিবছর তারা পালন করে জনগণের সুখের বছর- Festival of The Peoples of Happiness! অভিযোগ হয়, কেউ সে অভিযোগ শোনে না। বা যদি খুব বেশি অভিযোগ হয় হিংসার মাধ্যমে তাকে দমন করা হয়। আর যাঁরা দমন করেন তাঁরা যখন সমাজের দিকে তাকান তখন তাঁরা দেখেন এই সমাজটাই তো তাঁদের সমাজ। সেখান থেকেই তো তাঁরা উঠে এসেছেন। অর্থাৎ প্রশ্নটা জাগে, আমি দেখি দুর্নীতি, বিশৃংখলা আবার তার মধ্যেও সুখের সংসার। সুখের বাৎসরিক অনুষ্ঠান পালন করছি। কি করে? কেন? কিভাবে? এই যখন কিছুদিন আগেও আমি ক্লাসে পড়িয়েছি - যারা আমার ছাত্ররা উপস্থিত আছেন, হয়তো মনে করবেন – Globalisation নিয়ে খুব পড়াতাম। নিশ্চয়ই সবাই পড়িয়েছেন -যারা মাস্টারমশাই এখানে আছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়ত পড়িয়েছেন - সেখানে একটা বিশাল স্বপ্নের কথা বলা হতো: যে একদিন পৃথিবী খুব সুন্দর হবে। তৈরী হবে borderless world, global village- সে অনেক বড়ো বড়ো কথা। কিন্তু আমি যেটা দেখেছি বা যেটা পড়েছি বা যেটা সমাজবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখিয়েছেন, সেটা শুধুমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে নয়, সেটা আফ্রিকার ক্ষেত্রেও যেমন প্রযোজ্য আবার ইউরোপের কোন কোন শহরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। একজন মানুষ - তার বাড়িতে খাবার নেই। তিনি খাবার আনবেন কোথা থেকে? পাশের বাড়িতে গিয়ে বলছেন যে আমাকে কিছু গম দেবে? আমার ঘরে খাবার নেই, আমার বাচ্চাদের মুখেও আমি কোনও খাবার তুলে দিতে পারছিনা। যার ঘরে কিছু খাবার আছে সে বলছে - নাগো আমি কিছু দিতে পারব না। তুমি তোমারটা জোগাড় করে নাও, Do it yourself. এটা বিভিন্ন জায়গায় ঘটেছে। যে সমাজকে আমি একদিন কল্পনা করেছিলাম আমার নিজের সমাজ বলে- সেই সমাজ আজকে আমার কাছে শূন্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে, imagined community হয়ে গেল একটা empty community। সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা, সমাজবিজ্ঞানীরা এই জায়গাতে এসে একটা ভয়ের মুখোমুখি দাঁড়ান। ভয়টা কোথায়? ভয়টা খুঁজতে গিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় Tocqueville-এর একটা বই 'Democracy in America'-এ volume-2-তে। বহুদিন আগের লেখা একটা বই, সেখানে Tocqueville একটা ভবিষ্যৎ বানী করেছিলেনঃ এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ নিজেকে ছাড়া আর কিছুই ভাববে না। নিজের পরিবার, কিছু পরিচিত মানুষ, এই হবে তাঁর পৃথিবী, অন্যদের হয়তো সে চিনবে কিন্তু জানবে না। সে তাঁদেরকে ছুঁয়ে যাবে কিন্তু অনুভব করবে না। সে ব্যস্ত থাকবে শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে। আর এই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকাই হবে আগামী দিনের স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠার সর্বোত্তম পদ্ধতি।

১৯৯৫ সালে Umbarto Eco একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন – প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'UR-FASCISM'। এই প্রবন্ধে তিনি ফ্যাসিবাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছিলেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষকে নিঃসঙ্গ করে দেওয়ার প্রবণতা। কিন্তু তার মানে কি এই যে যাঁরা সমাজবিজ্ঞান পড়েন, তাঁরা এই ভয়, এই উদ্বিগ্ন পরিবেশের মধ্য থেকে কি এগোন না? এগোতে চান না? উত্তর হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের জগতে এক ধরনের একটা সংক্রামিত আশাবাদ আছে এবং সেই আশাবাদই এই সমাজবিজ্ঞানীদেরকে এগিয়ে নিয়ে চলে এবং তাঁরা একই সঙ্গে প্রমাণ করেন যে আজকে যে ঘটনা ভারতবর্ষে ঘটছে সেই ঘটনা পৃথিবীর অন্য কোনও প্রান্তেও হয়তো একই সঙ্গে ঘটছে। এরিক হবসবমের আত্মজীবনী Interesting Times-এ একটি বর্ণনা আমার অসাধারণ লেগেছে। উনি সেই মাচুপিচুতে বসে মাচুপিচুকে দেখছেন। একটা বই কিনেছেন- পাবলো নেরুদার কবিতার বই- সেটা নিয়ে সেখানে বসে সেই মাচুপিচু কবিতাটি তিনি পড়ছেন। তাঁর মনে হচ্ছে যে এখানে বসে না পড়লে পরে কবিতাটির সঠিক মর্ম বোঝা যাবেনা। সেই কবিতার মধ্যে তিনি একটা সূত্র খুঁজে পাচ্ছেন এবং আমার নিজের ধারণা যে সেটা যেন আমরাও খুঁজে পাই আমাদের জীবনের মধ্যে। হবসবম কোথায় পেরুতে বসে কবিতা পড়ছেন। সূর্যের আলো পড়েছে। বিকেলের সূর্যের আলো ছুঁয়ে যাচ্ছে আর্জেন্টিনা এবং আন্দিয়ান পর্বতমালাকে। সেখানে বসে তিনি পড়ছেনঃ আমাকে নীরবতা দাও, জল দাও, আশা দাও। আমাকে সংগ্রাম দাও, লোহা দাও, আগুন দাও। আমাকে চুম্বকের মত আলিঙ্গন করো। আমার স্বরের সঙ্গে তোমার স্বর মিলিয়ে দাও। আমার স্বরের মধ্য দিয়ে, রক্তের মধ্য দিয়ে তুমি কথা বল। কিসের কথা? পৃথিবীটা আরো সুন্দর করে তোলার কথা। একটু মিলিয়ে নিই আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বিখ্যাত কবিতাটি - ওরা কাজ করে। ঠিক একই সুর একই কথা – "ওরা চিরকাল ধরে দাঁড় টানে....দুঃখ সুখ দিবসরজনী মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্র ধ্বনি, শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে ওরা কাজ করে।" সমাজবিজ্ঞানী যখন চিন্তা করেন, সমাজকে দেখেন তখন তিনি যেমন একদিকে উদ্বিগ্ন এই সমাজকে নিয়ে ঠিক তেমন ভীত-সন্ত্রস্ত। এই ভীতি কিন্তু তার ব্যক্তিগত ভীতি নয়। ভীতি ভবিষ্যতের সমাজকে নিয়ে আর তারই সঙ্গে এক অসাধারণ আশাবাদ তাঁদের মধ্যে কাজ করতে থাকে। এই উৎকণ্ঠা, অসহায়তা, বিষন্নতা আর আত্মপ্রত্যয় - এরই মধ্য দিয়ে সমাজবিজ্ঞান এগিয়ে চলে। সমাজবিজ্ঞানের এই গতিময়তার মধ্যে আমরা কি খুঁজে পাই? আমরা, সমাজবিজ্ঞানের ছাত্ররা, খুঁজতে চেষ্টা করি নৈতিক মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে মানবিক সমস্যাগুলির সমাধানের পথ। আমরা বলতে চাই মানুষের ন্যূনতম চাহিদার কথা, যুক্তিভিত্তিক মনের কথা, ব্যক্তির সাথে সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা। আমরা দেখতে চাই Self-এর সাথে Community-র সম্পর্কের কথা। কিভাবে সার্বজনীন সুখের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়, কিভাবে জ্ঞান সঞ্চয় করা যায়, যুক্তির প্রয়োগ করা যায়, ব্যক্তিস্বার্থ-সমাজস্বার্থের সমন্বয় করা যায়। যুক্তি ও মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে নির্মিত হোক এক সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা।

এটা ছিল একটা ধারা এবং একটু আগে যেটা আমাদের সৌরীশ বলল যে, আমরা তো বোকা। তখনো কিন্তু এই কথাগুলো যারা বলেছিলেন বা যেগুলো পড়ানো হয়েছে, আমরা পরবর্তীকালে বলেছিলাম এটা একটা বোকাদের স্বপ্ন – 'naive optimism'। এগুলো ভেবে কোনও লাভ নেই। এগুলো ঘটবে না। ফলে আমাদের যখন ছাত্রাবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটছে কিছুটা -আমরা এখনো ছাত্র-জীবনের মধ্যেই রয়েছি। ছাত্রজীবন কখনো শেষ হয় না- হঠাৎ এসে আমরা দেখতে শুরু

করলাম যে যুক্তির সীমাবদ্ধতা, এবং সেখানে যেটা দেখা গেল সেটা হচ্ছে ‘universalism of negative capitalism’। যুক্তির সীমাবদ্ধতা, ক্ষমতার সার্বজনীনতা এবং সমাজের ভিত্তি হচ্ছে ক্ষমতা, ক্ষমতাহীনতা, ভয়, নিষ্ঠুরতা। অবশ্য তার সঙ্গে একটা ছোট্ট করে জিনিস যোগ করা হয়েছিল। ক্ষমতা যেরকম প্রভুত্ব তৈরি করে, ক্ষমতা তেমনি কিন্তু প্রতিরোধের পথও তৈরি করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজকে যখন আমাদের- অন্তত আমি সমাজবিজ্ঞানের সব কিছুর কথা বলতে পারছিনা- যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আমি দেখি সেখানে আমি একটা জিনিস দেখি যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চেহারাটা যেন হঠাৎ বদলে গেছে। হয়তো সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য জায়গাটাও বদলে গেছে। ধর্ম, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ,অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মৌলবাদ এই হচ্ছে আজকের রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার জায়গা। বিশ্বাসকে সামাজিক একীকরণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা, সমাজের বিভাজন তৈরি করা, সহযোগী বনাম বিরোধী, আমি এবং তুমি, আমরা এবং তোমরা- লক্ষ্য একটা বিশেষ ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বজায় রাখা এবং একই ছাঁচে সমাজকে তৈরি করা। আত্মচেতনার বৈচিত্র্য বা বিকল্প চিন্তা ভাবনা যেন সেখানে ব্রাত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই যদি সমাজবিজ্ঞানের বা ছোট করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণার ধারা হয় তাহলে বাস্তবটিই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। আমি যখন এই জগৎ থেকে- এই সমাজবিজ্ঞানের জগৎ থেকে যখন আমি বাস্তব পৃথিবীতে নেমে আসি তখন যা দেখি তা হৃদয়-বিদারক। নিদারুণ দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অসহায়তা, মানবতার নিদারুণ লাঞ্ছনা, অশিক্ষা, কুশিক্ষার অন্তহীন প্রসার সমস্ত কিছু ঢেকে দেওয়ার জন্য তথ্যের বিকৃতি, বিবেকহীন প্রচার, অর্থনীতির বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা, দেশপ্রেমের নামে সত্য গোপনের বিলাসিতা, সমাজবিজ্ঞানে সত্যানুসন্ধানের পথকে করে তুলেছে দুর্গম এবং কলুষিত। পরিস্থিতিটা মাঝেমধ্যে মনে হয় এমন যে মহাকাব্য তো দূরের কথা কোনও কাব্যই বোধহয় আর রচনা করা যাবেনা। সমাজবিজ্ঞানকে আমি নূতন করে তৈরি করব, নূতন করে ভাববো, আমার পাড়ার বাচ্চা মেয়েটিকে আমি স্কুলে নিয়ে যাবার পথ দেখাবো বা পথ চিনিয়ে দেবো এটা বোধহয় আজকে আর সম্ভব নয়। আমি যখন স্কুলগুলোর খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনে দেখি, যে স্কুলগুলোকে আমি খবরের কাগজের ছবিতে দেখি, সেই স্কুলগুলোকে আমি আমার পাড়ায় দেখিনা। অত পোশাক, এয়ারকন্ডিশন, কম্পিউটার ইত্যাদি। আমার পাড়ার ছোট স্কুল আমি দেখিনা। এ শুধু কল্পনা শক্তির অবক্ষয় নয়, অনুপস্থিতি নয়, এ হল এমন এক পরিবেশ যেখানে রাষ্ট্র এবং তথাকথিত সামাজিক হিংসা তার ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে যখন সমস্ত শুভ চেতনা শুভবুদ্ধি আশ্রয় নিচ্ছে এক নিশ্চিত নীরবতায়।

এখানে একটা প্রশ্ন তো খুব স্বাভাবিকভাবে ওঠে। এই যে তিনটি ধারা আমি উল্লেখ করলাম একটু আগে। একদিকে ‘Naive optimism’, অন্যদিকে ‘Negative Capitalism’, এক বিচিত্র ধরনের Research Agenda তৈরি করছে। এরা কি পরস্পর বিরোধী? আমাদের সমীক্ষা ও সংশয়ভিত্তিক চিন্তাধারা হয় আত্মসমর্পণ করেছে অথবা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান সংরক্ষণশীল ওই হিংস্র সমাজতাত্ত্বিক কর্মসূচিতে। কিন্তু একটা জায়গাটাতে আমার বড়ো দুঃখ হয়। আমি হঠাৎ দেখলাম যে পৃথিবীটা এমনভাবে তৈরি হচ্ছে যেখানে সমাজতত্ত্বের গবেষণা যেন একটা বিপদজনক দিকে চলেছে। ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামার বিখ্যাত ও বিতর্কিত বইটির উল্লেখ করি। বইটি হচ্ছেঃ ‘The End of History and The Last Man’। কে এই ‘Last Man’? এই ‘Last Man’ কিন্তু খুব ভয়ংকর মানুষ। নীটশের থেকে ফুকুইয়ামা এটা নিয়েছেন। নীটশের জরাথুস্ট্র জনগণকে জিজ্ঞাসা করেছেন: তোমরা কী চাও? তাদের উত্তর হচ্ছে “Give us this last man,

Zarathustra!” কী সেই Last Man এর বৈশিষ্ট্য? সে চায় আরও জৈবিক নিরাপত্তা, স্থুল ভোগসর্বস্বতার প্রাচুর্য্য, সে চায় আরও আরও ভোগ্যপণ্য। কিন্তু এটাই কি সব? তিনি বলছেন যে রাজনীতিবিদরা - উনি পশ্চিমী রাজনীতিবিদদের কথাই বলছেন- কিন্তু এই জিনিসগুলোই তুলে ধরছেন মানুষের কাছে। ফলে চিন্তা না করলেও চলবে। চিন্তাভাবনা বাদ দিলে মানব সমাজ কোথায় যাবে? রাজনীতিবিদরা সম্ভবতঃ সেই চিন্তাবিহীন এক পৃথিবীকেই তুলে ধরতে চাইছেন? ফুকুইয়ামার বক্তব্য আমরা কোথায় যাচ্ছি আমরা কেউ জানিনা, এবং ফুকুইয়ামার বইটা যখন শেষ করবেন আপনারা, তখন দেখবেন ফুকুইয়ামা কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ফুকুইয়ামা- একেবারে সেখানে নির্বাক।

ঠিক এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমি আজকের যে সমাজকে দেখি, সেখানে আমরা ফিরে যাচ্ছি একেবারে সেই পুরোনো দিনে। নূতন যুগের আলো জ্বলবে এ কথা ভাবতে পারছিনা। আজকে রাষ্ট্রের কোন কাজ নেই। রাষ্ট্র চাকরি দেবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কিন্তু জানাতে হবে কতজন চাকরি পেল। তার ওপর নির্ভর করবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কতখানি সার্থক হয়েছে। কিন্তু আমার অধিকার রাষ্ট্র ভঙ্গ করতে পারে। কিন্তু আমাকে কর্তব্য পালন করতেই হবে। সংবাদপত্রে আমি দেখি অমুক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাকরি পেয়েছে, মাসে বা বছরে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাইনে। কিন্তু কত পঞ্চাশ লক্ষ ছেলে মেয়েরা চাকরি পেল না- তারা হারিয়ে গেল, তার হিসেব খবরের কাগজে মাঝে মধ্যে আসে তারপরে আবার হারিয়ে যায়। আসলে রাষ্ট্র একটা Lost generation তৈরি করেছে গত কয়েক দশক ধরে। কিছুদিন আগেও  বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এসে জিজ্ঞাসা করতোঃ স্যার, এইতো এম.এ. পাস করব, এর পরে কি করব? এখন এক ভয়ানক পরিবর্তন দেখিঃ এখন আর ছাত্রছাত্রীরা জিজ্ঞাসা করে না কি করব। আমাদের ভবিষ্যৎটা কি? আবার যদি কেউ কখনো জিজ্ঞাসা করেও ফেলে 'সৌভাগ্য'। দু'বছর আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের মুখোমুখি হতে হয়নি। কিন্তু যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তাহলে আমরা বিব্রত বোধকরি। কি বলব আমাদের এই ছাত্রছাত্রীদের কাছে? সমাজবিজ্ঞান কি এটা ভাববে? আসলে আজকে রাষ্ট্রের কোন দায় নেই। একজন ইটালিয়ান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা দার্শনিক Agamben। তিনি একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন- ‘Bare Life’. তাঁর বইটা ১৯৯৮ সালে অনূদিত হয়েছে HOMO SACER: ‘Sovereign Power and Bare Life’। এখানে মানুষের জায়গা হচ্ছে শিবিরে। ‘Bare Life’ মানে হচ্ছে যেটা abnormal, অস্বাভাবিক, সেটাকে স্বাভাবিক করে তোলা। Concentration camp-এর উদাহরণ দিয়ে সেটা অনেকেই দেখিয়েছেন। আমরা চাকরির জন্য রাষ্ট্রের কাছে যেতে পারিনা। তবুও রাষ্ট্র আছে। আছে সম্মতি অথবা বলপ্রয়োগ এই দুইয়ের মধ্য দিয়ে তার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য। সে আছে একান্ত নজরদারির মধ্যে দিয়ে। আছে নাটকীয় কাজকর্মের মধ্য দিয়ে তার নিজের বৈধতা তৈরি করার জন্য। আছে নীরবতার সংস্কৃতিতে। আছে চাটুকারিতা বৃত্তিতে। এই হচ্ছে বর্তমানে রাষ্ট্র। ঠিক এই জায়গাতে আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে একটা প্রশ্ন রাখিঃ কি হবে এই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা? সেকি হারিয়ে যাবে চিরকালের জন্য? সমাজবিজ্ঞানী কি হয়ে যাবেন ব্রাত্য? আমরা কি বলব যে সমাজবিজ্ঞানী আপনার কথা শুনতে খুব ভাল লাগে, কিন্তু যখন তার অলংকরণ ঢেকে রাখে বাস্তবের রূঢ়তাকে, তর্কের জাদুকরী প্রভাব আড়াল করে রাখে যথার্থ সত্যের উপস্থাপনাকে, তখন কি আপনি কোনও আত্মসমীক্ষায় ব্রতী হন? আপনি কি সেই তথ্যকে তুলে ধরেন যা

মানবজীবন ও মনুষ্যসমাজের জন্য স্থায়ী মঙ্গল ডেকে আনে যা একই সাথে হয়ে ওঠে উপকারী ও আনন্দদায়ক?

আজকে আমি যখন এখানে আলোচনা শুনছিলাম তখন প্লেটোর কথা দুই তিন বার উচ্চারিত হয়েছে। আমার প্লেটোর প্রতি একটু দুর্বলতা আছে। আমি শুধু একটা অনুরোধ করব ছাত্রছাত্রীদের কাছে। প্লেটোর 'রিপাবলিক' বইটি একটু ভালো করে পড়ো- এবং পড়তে গিয়ে দেখো তিনি যা যা উল্লেখ করেছেন তার অনেক ঘটনা আমাদের আজকের জীবনেও ঘটছে। আমি প্লেটো নিয়ে বিশেষ আলোচনা করতে চাইছি না। আমি প্লেটোর 'রিপাবলিক' থেকে একটা বা দুটো উক্তি তুলে ধরতে চাই। কবিরা খালি কবিতা লিখছেন। তখন প্লেটো বলেছিলেন, তোমাদের কবিতা লেখার কোনো দরকার নেই। কী হবে তোমাদের কবিতা লিখে? কি কবিতা লিখছো? যে ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখছো সে ঘটনা তো কোনদিন ইতিহাসে ঘটেনি। মানুষের যুক্তিবোধকে বন্ধ করে দিচ্ছ। তোমরা সেই কবিতা লেখো যে কবিতা মানুষের যুক্তিবোধকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আজ থেকে দীর্ঘদিন আগে প্লেটো যে প্রশ্নটি কবিদের নিয়ে করেছিলেন, সেই প্রশ্নটিরই আমরা সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুকরণ করতে চাইছি। প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এর Book 3, Book 8 ও Book 10-এ এই আলোচনা করা হয়েছে। আমি একটা উক্তি উল্লেখ করি। প্লেটো এক জায়গায় লিখছেন, "অনেক কবি ও গদ্য লেখকগণ বলেছেন, অনৈতিক মানুষেরা প্রায়শই সুখী আর নৈতিক মানুষেরা প্রায়শই অসুখী হয়, আর ধরা না পড়ে পার পেয়ে যেতে পারলে অন্যায় করা লাভজনক হয়ে ওঠে। আর অন্যের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ভালো হলেও নিজের স্বার্থের ক্ষেত্রে তা প্রতিকূল। আমার ধারণা এই ধরণের দাবী নিষিদ্ধ করতে হবে, তাদেরকে বলতে হবে তারা যেন তাদের কবিতা ও গল্পের উল্টো বক্তব্য তুলে ধরেন।" সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বক্তব্য কি আমরা অনুকরণ করতে পারিনা? কিছু মনে করবেন না - প্লেটো তাঁর সমসাময়িক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে একটি মন্তব্য করেছেন, যেটা আমি উল্লেখ করতে চাই। তিনি বলেছেনঃ " এ ধরণের পরিস্থিতিতে শিক্ষকগণ ছাত্রদের ভয় পায়, তাদের মর্জি মেনে চলে...... সংক্ষেপে বলা যায়, তরুণ প্রজন্ম বয়স্ক প্রজন্মের মতো দেখতে হয়ে যায় আর যেকোনো আলোচনা, অথবা, ক্রিয়াকাণ্ডকে তারা বয়স্কদের বিপরীতে নিজেদের শক্তি পরীক্ষায় পরিণত করে, অপরপক্ষে, সমাজের বয়সী প্রজন্মের সদস্যরা যেহেতু বেমানান স্বৈরতন্ত্রী হতে চায়না, তাই তুচ্ছ কথাবার্তা বলে আর চাকচিক্য দেখিয়ে নিজেদের আচরণকে তরুণদের মডেলে গড়ে তোলে, আর তরুণ প্রজন্মের সদস্যদের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়।" সাম্প্রতিককালের ঘটনাবলীর সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় নাকি? এই দুটো উদ্ধৃতি-ই আমি নিয়েছি অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া অনুদিত প্লেটোর 'রিপাবলিক' থেকে - অনুবাদটি ২০২০ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

মূল প্রশ্নটা হচ্ছেঃ সমাজবিজ্ঞানীরা তো সংকটের মুখোমুখি হয়েই সবসময় চলেছেন। সমাজের সংকটকে সমাধান করতে চেয়েছেন। স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্ন না দেখে তো তাঁরা চলেননি। তাহলে আমরা এই সমাধানের থেকে বেরোবো কি করে? এর থেকে বেরোনোর কোনও পথ আছে কি? আবার আমি একটুখানি সেই প্লেটোতে ফিরে যাই। প্লেটোর একটা বিখ্যাত বই 'The Collected Dialogues of Plato including the Letters'- এটা হচ্ছে মূলত সক্রেটিসের এর বিচার নিয়ে। এই বইয়ের মধ্যে আমি 'Letters' অংশ বাদ দিচ্ছি। বইটিতে আমরা তিনটি অধ্যায়ের উল্লেখ করি। প্রথম হচ্ছেঃ 'Apology'- এখানে দেখানো হচ্ছে সক্রেটিসের বিচার। এই অধ্যায়টিতে প্রতিফলিত হচ্ছে সমাজের সমস্ত দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। দ্বিতীয় অধ্যায়টির শিরোনাম - 'Crito'। Crito হচ্ছেন সক্রেটিসের বন্ধু- ইনি চাইছেন সক্রেটিসকে কারাগার থেকে মুক্ত করতে। তৃতীয় অধ্যায় হচ্ছে- 'Phaedo'। ইনি হচ্ছেন সক্রেটিসের ছাত্র। ইনি সক্রেটিসের অন্তিমলগ্নের

শেষ সাক্ষী। একেবারে প্রথম যেখানে 'Apology' সেখানে একটা বিরাট প্রশ্ন উঠছে। একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান পড়ার জন্য দুটো ভিত্তির উল্লেখ করেছেন। একটা হচ্ছে 'Hermeneutics of suspicion' , আর একটি হচ্ছে 'Hermeneutics of difference'।

প্রথম অধ্যায়টি 'Hermeneutics of suspicion'- এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখানে সক্রেটিস প্রশ্ন করেছেন সমাজের অনুসৃত নিয়মাবলীকে, পদ্ধতিকে, প্রতিষ্ঠানকে-এমনকি কর্তৃপক্ষকেও, তুলে ধরেছেন সমাজের আশা, আকাঙ্ক্ষাকে, স্বপ্নকে, শঙ্কাকে। প্রশ্ন করেছেনঃ মানুষই যদি সুখী না হয় তাহলে কী হবে এই দেওয়াল তুলে, যুদ্ধ জাহাজের গরিমা দেখিয়ে আর বিশাল মূর্তি তৈরী করে? জনগণ সব শুনল, মেনে নিল-কিন্তু সিদ্ধান্তঃ সক্রেটিসের মৃত্যুদন্ড। সক্রেটিসের শেষ মন্তব্যঃ "Now it is time that we are going. I to die, and you to live, but which of us has the happier prospect is unknown to anyone but God।"এই হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানীর Critical anxiety- সে কি আত্মসমর্পণ করবে ক্ষমতা ও হিংসার সামনে? আলিঙ্গন করবে নিঃসঙ্গতার নীরবতাকে? যুক্তি বনাম আবেগ - এই দুটোর মধ্যে কোনটা হবে বেশী গুরুত্বপূর্ন? এখানে আমি সক্রেটিসকে অনুকরণ করি। যুক্তি এবং আবেগ দুটো একসঙ্গে চলতে পারে না। আবেগকে সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু যুক্তিকে থাকতে হবে। আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে এই যুক্তি কিন্তু শুধু শুধু ভালো উদ্দেশ্যেই যুক্তি তৈরি হয় না। যারা খারাপ কাজ করে, যারা অন্যায় করে তারাও কিন্তু যুক্তি তৈরি করে। সক্রেটিস তো জেলে চলে গেছেন- কি করা হবে সক্রেটিসকে নিয়ে? ক্রিটো হচ্ছেন সক্রেটিসের বন্ধু। ক্রিটো সেখানে হাজির হয়েছেন। গিয়ে বলছেন সক্রেটিস তুমি তো পন্ডিত মানুষ। তোমাকে যদি মেরে ফেলা হয় তাহলে পৃথিবীর বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। তখন সক্রেটিস বলছেনঃ আরে আমার তো সত্তর বছর বয়স হয়েছে, আমি আর কতদিন বাঁচব? যদি আমি এখান থেকে পালিয়ে যাই, তখন সবাই বলবে, তুমি অন্যায়ের বিরূদ্ধে লড়াই করেছ অন্যায়ের সাহায্য নিয়ে, ভুলকে ফিরিয়ে দিয়েছ ভুল দিয়েই, আর অসৎ এর আশ্রয় নিয়েই দমন করতে চেয়েছ অসৎকে। আর এখানেই আঘাত করেছ তাঁদেরকে যাঁদেরকে আঘাত করার কথা নয়- নিজেকে, নিজের আপনজনকে, নিজের দেশকে। সেই সময় গ্রিক সমাজের যে চেহারা ছিল, যা দুর্নীতি ছিল, তাতে সক্রেটিসের কারাগার থেকে মুক্তি অনিবার্য ছিল। সক্রেটিসের বক্তব্য হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় শুধুমাত্র ন্যায় দিয়ে। একটা discourse তো আছে পৃথিবীতে। আমাদের বিকল্প discourse তৈরি করতে হবে। তা না হলে আমরা এগোতে পারব না, দাঁড়াতে পারবো না। ঠিক এখানেই যেন প্রতিফলিত হচ্ছে এক 'unsettled fear'।সমাজবিজ্ঞানীকে কোণঠাসা করে রাখা হচ্ছে। একইসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানীদের প্রতি তিনি যেন বলছেন যে, একটা বিকল্প সমাজের কথা ভাবতেই হবে। বিকল্প ভাবনাচিন্তা করতে হবে। তা না হলে এই সমাজ এগোবে না। সক্রেটিস বলেছেন তুমি আইন না মেনে তো কোন কিছু করতে পারো না। কিন্তু ক্রিটো, যিনি Civil Society-র গতানুগতিক ধারার প্রতিনিধিত্ব করেন, তিনি মনে করেছেন সমাজের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, নিজ স্বার্থসিদ্ধি করতে। সে বুঝতেও চাইছে না যে বিকল্প তৈরি করতে হবে। সেই যুক্তির ওপরে ভিত্তি করে সমাজ চালাতে হবে। সমাজবিজ্ঞানীর সামনে এক 'unsettled fear'- জনগণ জানে সমাজে দুর্নীতি আছে, বিশৃঙ্খলা আছে, তবুও সেই জনগণই মেতে উঠছে "সুখের উৎসবে।" কিন্তু কেন? সক্রেটিসের শেষ বক্তব্য হচ্ছে, "Who is not pure himself to attain to the realm of purity would no doubt be a breach of universal justice।" বিপক্ষের যুক্তির প্রতি অনীহা এক দুর্যোগের

প্রতিফলন। আর, অশিক্ষিত মানুষই বিভিন্ন ঘটনার যথার্থকে অস্বীকার করে- এবং শুধুমাত্র নিজের বক্তব্যকে অপরের কাছে তুলে ধরতে সচেষ্ট থাকে। আর সবশেষে হচ্ছে Phaedo - তিনি হচ্ছেন সক্রেটিসের একজন ছাত্র। মানে এখানে কোথাও সক্রেটিস নেই। সক্রেটিস চলে গেছেন। এবার Phaedo এসে সক্রেটিসের ছাত্রদের বলছেন সক্রেটিস শেষ মুহূর্তে কি বলেছিলেন? শেষ মুহূর্তে যেটা সক্রেটিস বলেছিলেন সেটা হচ্ছে তোমরা শান্ত হও এবং সাহসী হবার চেষ্টা করো। তার মধ্যে আছে এক 'infectious optimism'- সুচিন্তিত ভাবনা, যুক্তিকেন্দ্রিক চেতনাবোধ, শ্রদ্ধাভিত্তিক আলোচনা ও কথোপকথন, ও প্রশ্ন করার অধিকার তৈরি করবে এক সুসভ্য, স্বাধীন, প্রগতিশীল সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা।

আমি শেষ করি শুধু এই কথাটুকু বলেঃ সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা এবং পঠন-পাঠনের মধ্যে, সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং তথ্যের মধ্যে নিহিত আছে এক অবিচল গতিময়তা আর প্রশান্ত মাধুরী। যা থাকে না সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় তা হচ্ছে উগ্র মাদকতা। এ কথা বলা বোধহয় ভুল হবেনা - আমি রবীন্দ্রনাথ থেকে তুলে ধরছি - মানুষের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোন জাতির মধ্যে বদ্ধ হতে পারে না। তা কৃপণের আরদ্ধ ভান্ডারের সম্পদ নয়। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে আছে একটি বিশেষত্ব। সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তিতে লুকিয়ে আছে বিশ্লেষণী চেতনা। আমি একজন সমাজবিজ্ঞানের আগ্রহী ছাত্র হিসেবে বিশ্লেষণী সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা এমন এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখুন, এমন এক বিশ্বব্যবস্থায় উপনীত হবার কথা বলুন যেখানে সবাই কাজ করার সুযোগ পাবেন। যুবক-যুবতীদের উপহার দেবে এক সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন আর আমার মতন বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা যদি কেউ থেকে থাকেন তাদেরকে দেবে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার আশ্বাস। আমরা তৈরি করি এমন এক পৃথিবী যেখান থেকে লোভ, হিংসা, অসহনশীলতা হবে চির নির্বাসিত। আমরা সেই পৃথিবী তৈরি করি যেখানে যুক্তিবিজ্ঞান প্রগতির কথা বয়ে নিয়ে আসবে, সুখী জীবনের নির্মল বাতাস। আমি শুধু শেষ করি এইটুকু বলে স্বপ্ন তো দেখলাম। এগোবো কোথায়? সমাজবিজ্ঞানের গতিময়তা কোন দিকে চলে? সক্রেটিসের বক্তব্যকে অনুসরণ করে বলিঃ আসুন আমরা নতুন করে চিন্তা করি, নতুন করে বিশ্লেষণ করি, নতুন করে শুনি, নতুন করে অনুভব করি, নতুন করে লিখি- যা আলিঙ্গন করবে যুক্তিকে, যা আহ্বান করবে প্রগতিকে, যা সমস্ত যন্ত্রণার মধ্যে খুঁজে নেবে সুন্দরকে আর সেটাই হবে সমাজবিজ্ঞানের দুনিয়াতে স্বপ্নময় পরিক্রমা।